স্বারক নং-৫২.০১.২৭৩৮.০০০.০৩.১৫৭.১৪- তারিখ :-

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

**কান্তজীউ মন্দিরঃ**

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে এবং দিনাজপুর-তেতঁলিয়া সড়কের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে ঢেপা নদীর পারে এক শান্ত নিভৃতগ্রাম কান্তনগরে এ মন্দিরটি স্থাপিত।

কান্তনগর মন্দির ইটের তৈরী অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দির। দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে এবং দিনাজপুর-তেতঁলিয়া সড়কের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে ঢেপা নদীর পারে এক শান্ত নিভৃতগ্রাম কান্তনগরে এ মন্দিরটি স্থাপিত। বাংলার স্থাপত্যসমূহের মধ্যে বিখ্যাত এ মন্দিরটির বিশিষ্টতার অন্যতম কারণ হচ্ছে পৌরাণকি কাহিনীসমূহ পোড়ামাটির অলঙ্করণে দেয়ালের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ নবরত্ন বা ‘নয় শিখর’যুক্ত হিন্দু মন্দিরের চুড়া হতে আদি নয়টি শিখর ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের সর্বৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নির্দশন রয়েছে এ মন্দিরে।

মন্দিরের নির্মাণ তারিখ নিয়ে যে সন্দেহ ছিল তা অপসারিত হয় মন্দিরের পূর্বকোণের ভিত্তি দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত সংস্কৃত ভাষায় লেখা কালানুক্রম জ্ঞাপক একটি শিলালিপি থেকে। সূত্র অনুযায়ী দিনাজপুরের মহারাজ প্রাণনাথ ১৭২২ সালে এ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং তাঁর স্ত্রী রুকমিনির আদেশে পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য মহারাজের দত্তকপুত্র মহারাজ রামনাথ ১৬৭৪ সালে (১৭৫২) মন্দিরটির নির্মাণ সম্পন্ন করেন। যা হোক, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মহারাজা গিরিজানাথ বাহাদুর ধ্বংস হয়ে যাওয়া নয়টি শিখর বাদে মন্দিরটির ব্যাপক পুনর্গঠন করেছিলেন।

এ জমাকালো পিরামিড আকৃতির মন্দিরটি তিনটি ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে এবং তিন ধাপের কোণগুলির উপরে মোট নয়টি অলংকৃত শিখর বা রত্ন রয়েছে যা দেখে মনে হয় যেন একটি উচুঁ ভিত্তির উপর প্রকান্ড অলংকৃত রথ দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের চারদিকে খোলা খিলান পথ রয়েছে যাতে যে কোন দিক থেকেই পূজারীরা ভেতরের পবিত্র স্থানে রাখা দেবমূর্তিকে দেখতে পায়।

বর্গাকৃতির মন্দিরটি একটি আয়তাকার প্রাঙ্গনের উপর স্থাপিত। এর চারদিকে রয়েছে পূজারীদের বসার স্থান যা ঢেউ টিন দ্বারা আচ্ছাদিত। বর্গাকার প্রধান প্রকোষ্ঠটিকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ ইমারত নির্মিত হয়েছে। পাথরের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো মন্দিরটির উচ্চতা ৫০ ফুটেরও বেশি। ধারণা করা হয়, গঙারামপুরের(দিনাজপুর) নিকট বাননগরের প্রাচীর ধ্বংসাবশেষ থেকে নির্মাণ উপকরণ এনে এটি তৈরি করা হয়েছিল। বাইরের দিকে উচুঁ করে তৈরী তিনটি চতুষ্কোণাকার প্রকোষ্ঠ এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এ ধরণের নকশা কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠটিকে শক্তিশালী করেছে, তাই উপরের বিরাট চূড়াটিকে এ প্রকোষ্ঠটির পক্ষে ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

**প্রাচীন নগরী কুন্দারনপুর**

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার চোরগাছা সংলগ্ন গ্রাম কুন্দারনপুর। এ গ্রামে ৯টি প্রাচীন দিঘি আছে। আরও আছে যত্রতত্র প্রাচীন ইটের টুকরোর ছড়াছড়ি। এ গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী চোপাগাড়ী ও ছয়ঘট্টি পাঠশাঁওতে আছে যথাক্রমে ৩টি ও ৭টি প্রাচীন দিঘি। এখানকার প্রাচীন নগরীটি সম্ভবত গুপ্তযুগের অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার বলে ধারণা করা হয়। সম্ভবত কুন্দারনপুর ছিলো গ্রীক ইতিহাসে বর্ণিত পেন্টাপলিস বা পঞ্চনগরীর একটি।

**ফুলবাড়ি দুর্গ**

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার কাটাবাড়ি মৌজার ফুলবাড়ি দুর্গঅবস্থিত। ১৮৫৯-এর রেভিনিউ সার্ভে মানচিত্রে এ দুর্গের নাম গড় গোবিন্দ লেখা আছে। স্থানীয় জনশ্রম্নতি মতে এটি গড় গোবিন্দবা কানা রাজার গড়। লালমাটিতে গঠিত এই দুর্গের প্রাচীরগুলি প্রায় ২ মিটার প্রসত্ম এবং উচ্চতা ছিল প্রায় ৪ মিটার। এই দুর্গের প্রামাণিক কোন ইতিহাস পাওয়া না গেলেও এটি যে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের একটি নিদর্শন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

**গোপালগঞ্জ পঞ্চরত্ন মন্দির**

দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার গোপালগঞ্জ গ্রামে এ পঞ্চরত্ন মন্দির অবস্থিত। এ মন্দিরের পাঁচটি রত্নগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, হারিয়ে গেছে দেয়াল থেকে টেরাকোটার কারম্নকাজ সহ অন্যান্য অলঙ্করণ। কেবল টিকে আছে মূল কাঠামো। নৃপতি রামনাথ ১৭৫৪খ্রিঃ মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

**চাপড়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ**

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার বিনাইল ইউনিয়নের চাপড়া নামক স্থনে খুবই কৌতুহলোদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন রয়েছে। প্রত্ননিদর্শনসমূহ পরীক্ষান্তে মনে হয় এখানে দু’টি ভিন্ন সময়ে বসতি বিসত্মার লাভ করেছিল। চাপড়া গ্রামে অবস্থিত তিনটি মন্দির (সপ্তদশ-আষ্টাদশ শতাব্দী) দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং পুরো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, ইটের তৈরি কাঠামোর সত্মর ও পাথরের খন্ডংশ প্রথম পর্যায়ের বলে মনে হয়।

**সোনাভানের ধাপ**

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়নের খালসী মৌজায় সোনাভানের ধাপ অবস্থিত। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেশ প্রত্নতত্ত্ব গ্রম্নপের মতে ১৫০মি X৪০মি X৫ মি আয়তনের এই ঢিবিটি দিনাজপুর জেলার অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন ঢিবি।

বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাকি আটটি অলংকৃত চূড়া নিচের দু’তলার ছাদের আটটি কোণে সংযোজন করা হয়েছিল। নিচতলার বাঁকা কার্নিস কোণগুলিতে এসে ঝুলে আছে। এর মধ্যবাগ কিছুটা উঁচু হওয়ায় ভিত্তি থেকে এর উচ্চতা দাড়িয়েছে ২৫ ফুট, যার দ্বিতীয় তলার উচ্চতা ১৫ ফুট এবং তৃতীয় তলার ৬‘-৬‘‘। নিচের চারকোণের প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি করে ছোট প্রকোষ্ঠ রয়েছে এবং এগুলি দ্বিতীয় তলার উপরে স্থাপিত কারুকার্য খচিত অষ্টকোণাকৃতির কোণের বুরুজগুলির ভর বহন করছে। নিচতলার প্রার্থনা ঘরের চারদিকে মন্দিরে মোট চারটি আয়তাকার বারান্দা রয়েছে।

নিচতলার প্রত্যেক দিকের প্রবেশ পথে বুহু খাঁজ যুক্ত খিলান রয়েছে। সমৃদ্ধ অলংকরণ যুক্ত দুটি ইটের স্তম্ভ দ্বারা প্রতিটি খিলানকে পৃথক করা হয়েছে। নিচতলার চার প্রকোষ্ঠের বাইরে মোট ২১টি খিলান দরজা আছে, আর দ্বিতীয় তলায় এ খিলান দরজার সংখ্যা ২৭টি। ছোট হয়ে আসা তৃতীয় তলার মাত্র তিনটি প্রবেশ দরজা এবং তিনটি জানালা রয়েছে। পশ্চিম দিকের দ্বিতীয় বারান্দা থেকে ২‘-৩‘‘প্রশস্ত সংর্কীণ সিঁড়ি পথ উপরে উঠে গিয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন এ প্রবেশ পথ এঁকে বেঁকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় উঠে গিয়েছে।

পূজারীদের চালার বাইরে প্রধান মন্দিরের প্রায় একশগজ দূরে আগাছায় ছাওয়া একটি এক চূড়া বিশিষ্ট ছোট ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির রয়েছে। প্রচলিত ধারণা মতে মহারাজ প্রাণনাথ ১৭০৪ সালে এ মন্দিরটি তৈরি করে এখানে কৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সাময়িকভাবে বৃন্দাবন থেকে আনা হয়েছিল। নবরত্ন মন্দির তৈরি সমাপ্ত হলে এ মূর্তিটি এখানে স্থানান্তর করা হয়। এটি এখন একটি পরিত্যক্ত দেবালয়। এ মন্দিরটি ছিল ১৬ পার্শ্ব সম্বলিত সৌধ এবং এর উচ্চতা ছিল ৪০ ফুট এবং এর দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথে ছিল বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলান।

পোড়ামাটির অলংকরণ ভিত্তি থেকে শুরু করে মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত ভেতরে ও বাইরে দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চিতে তিনটি পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণে মনুষ্য মূতি ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলি বিস্ময়করভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মহাভারত ও রামায়ণের বিস্তৃত কাহিনী এবং অসংখ্য পাত্র-পাত্রীর বিন্যাস ঘটেছে এখানে।

কৃষ্ণের নানা কাহিনী, সমকালীন সমাজ জীবনের বিভিন্ন ছবি এবং জমিদার অভিজাতদের বিনোদনের চিত্র প্রতিভাত হয়েছে। পোড়ামাটির এ শিল্পগুলির বিস্ময়কর প্রাচুর্য, মূর্তির গড়ন কোমল ভাব ও সৌন্দর্য এত যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা

হয়েছে যে, বাংলার যে কোন ম্যূরাল চিত্রের চেয়ে তা অনেক উৎকৃষ্ট। কেউ যদি মন্দির দেয়ালের অলংকরণের দৃশ্য যে কোন দিক থেকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখেন এবং বিষয়বস্তুকে সমন্বিত করেন, তবে এর বিষয় বৈচিত্র দেখে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হবেন।মন্দিরের বাইরের দেয়ালের পোড়ামাটির অলংকরণের সাধারণ যে চিত্র, তাতে চারদিকের ভিত্তি প্যানেলের নিম্নাংশে চিত্রগুলি সমান্তরাল ভাবে চারটি প্রবেশ পত্রের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

এ দিক থেকে ভিত্তির একটু উপরেই ক) লতা পাতার মধ্যে প্রস্ফুটিত গোলাপ এবং এর বিকল্প হিসেবে কোথাও চারটি ধাতুর পাতে ধাতব প্রলেপযুক্ত ডিজাইন খ) স্ত্তম্ভের কার্নিসে যে প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তার মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক চিত্র ও মাটির খন্ডে তৈরী অভিজাত জমিদারদের শিকারের দৃশ্য প্রস্ফুটিত হয়েছে গ) উপরের সমান্তরাল প্যানেলে সূক্ষ্ম জটিল অলংকরণের মাঝে প্রস্ফুটিত গোলাপ ছিল, যা সাধারণভাবে ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাঘা মসজিদ, কুসুম্বা মসজিদ ও ছোট সোনা মসজিদ প্রভৃতির গায়ে লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অলংকরণের উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ হচ্ছে বনের ভেতর শিকার দৃশ্য,হাতি, ঘোড়া, উট সহযোগে রাজকীয় শোভাযাত্রা এবং অভিজাতদের জন্য চমৎকারভাবে তৈরী গরুর গাড়ি। তাদের গায়ে ছিল মুগল পোশাক ও অস্ত্র। সুন্দরভাবে সজ্জিত হাতি এবং ঘোড়া। এদের সঙ্গে যুক্ত রথসমূহ কারুকার্য সমৃদ্ধ ছিল। অলংকৃত পালকিতে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা নাদুস-নুদুস দেহের জমিদার, হাতে তার বিলাসী হুক্কা। হুক্কার অন্যদিকে লম্বা নল থেকে ধূঁয়ার কুন্ডুলি ছুড়ছেন। অন্যদিকে নদীর দৃশ্য রয়েছে, যেখানে লোকজনে ঠাসা সর লম্বা নৌকায় সকলে আন্দোৎসবে মগ্ন।

ছোট ছোট সৈন্যদলের গায়ে রয়েছে ইউরোপীয় পোশাক, খোলা তলোয়ার ও শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় তারা এগিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় ধাপের অলঙ্করণে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনীর চিত্রণ। এখানে লৌকিকভাবে কৃষ্ণর প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যায়ের পোড়ামাটির অলঙ্করণে রয়েছে দানব রাজা কংস কিশোর কৃষ্ণকে বধ করতে উদ্ধত, কৃষ্ণ কর্তৃক রাক্ষস পাতনা এবং সারস গলার দানব বাকাসুর হত্যা, গোবর্ধন পার্বতকে উপরে ফেলে কেশি হত্যা; স্বর্প দানব কালিয়াকে দমন এবং লম্বা সরু নৌকায় কৃষ্ণের আনন্দ ভ্রমণ ইত্যাদি। মন্দিরের দক্ষিণ মুখে কিছু বিভ্রান্তকর দৃশ্যসহ রামায়ণের কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীর চিত্র পূর্ব প্রান্তের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানে পঞ্চবটীর বনে রাম চন্দ্র, সীতা ও লক্ষণের বনবাসের রুপায়ণ রয়েছে, সূর্পনখার নাকে আঘাতরত লক্ষণ, দন্ডকের বন থেকে রাবন কর্তৃক সীতা অপহরণ; রাবণের রথকে বাঁধা প্রদানে জটায়ুর ব্যর্থ প্রচেষ্টা, অশোক বনে সীতার বন্দি জীবন; কিশকিন্দিয়ার সিংহাসনের জন্য বালী এবং বানর অনুসারী সহ সুগ্রীভের যুদ্ধ। এছাড়াও আকর্ষণীয় ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রাম চন্দ্রের সপ্ততলা বেদ এবং বানর অনুসারীসহ রামচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত ছিলেন সুগ্রীভ।

উত্তর দিকের প্রতিমূর্তিগুলির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল কৃষ্ণ বলরাম। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষ্ণের বিভিন্ন বিয়ের ছবি; গোয়ালিনী দন্ডের দু্ই মাথায় ঝোলানো শিকায় (পাটের ঝোলা) দুধ ও দৈ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অলঙ্করণের

দ্বিতীয় ধাপে একটি আকর্ষণীয় ইউরোপীয় যুদ্ধ জাহাজ খোদিত হয়েছে। এখানে সূক্ষ্ম ও বিস্তারিতভাবে দৃশ্যমান রয়েছে সৈনিক এবং কামান।

পশ্চিম দিকের পুরো অংশেই তৃতীয় ধাপের সূক্ষ্ম অলঙ্করণে কৃষ্ণ কাহিনীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ অলঙ্করণ শেষ হয়েছে মধুরার দানব রাজা কংসকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কংসের দানবাকৃতির খুনে হাতি কবল্লপীড়ার ধ্বংস, মথুরায় কংসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কৃষ্ণকে অংশগ্রহণে বিরত করতে না পেরে রাধার জ্ঞান হারানো। এসব চিত্রের মধ্যে দন্ডের দুই প্রান্তে ঝোলানো শিকাতে দুধ ও মাখন বহন করা গোয়ালার চিত্র খুবই আকর্ষণীয়, যা এখনও গ্রাম বাংলার অতি পরিচিত দৃশ্য।

বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলানের স্প্যান্ড্রিলের উপরে সম্প্রসারিত প্যানেলে চমৎকারভাবে দৃশ্যমান করা হয়েছে মহাকাব্যগুলির প্রাণবন্ত যুদ্ধের দৃশ্যাবলি। এতে আরও দেখানো হয়েছে একটি বৃত্তের ভেতর নৃত্যরত রাধাকৃষ্ণের যুগলশূর্তিসহ রস-মন্ডল ও এর সাথে অন্যান্য সহায়ক মূর্তি। কুরুক্ষেত্র ও লঙ্কার প্রচন্ড যুদ্ধের দৃশ্যাবলি রুপায়নে স্থানীয় লোকশিল্পীদের কল্পনা ও প্রচুর প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

আপাতঃদৃষ্টিতে মন্দিরের দেওয়ালে ব্যাপকভাবে পোড়ামাটির চিত্র অলঙ্করণকারী লোকশিল্পীদের অনেকেই এসেছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে। তারা তাদের পরিচিত পরিবেশের প্রভাব শিল্পকর্মে প্রতিফলিত করেছেন। প্যানেলে সূক্ষ্মভাবে চিত্রায়িত দেবতাগণের আদল কখনও কখনও বিস্ময়করভাবে তাদের সমাজের পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিলে গিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে পশ্চিমের সম্মুখভাগের নিচের দিকের প্যানেলের পোড়ামাটির অলঙ্করণগুলির কথা বলা যেতে পারে। এখানে কৃষ্ণ গাছ থেকে নারকেল পাড়ছিলেন এবং গাছের অর্ধেক পর্যন্ত আরোহণ করা তাঁর এক সঙ্গীর হাতে এটি তুলে দিচ্ছেন এবং নিচে অপেক্ষারত অন্য সঙ্গীর হাতে সে দিচ্ছিল নারকেলটি। এটি ছিল বাংলার একটি পরিচিত দৃশ্য। এখানে দেবতাকে এ সমাজের একজন পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। কতিপয় স্বতন্ত্র ফলক চিত্রও রয়েছে যেখানে স্বভাবিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ছিল। যেমন দক্ষিণ দিকে বারান্দার ভেতর দিকে একটি ফলক রয়েছে যেখানে রাধা-কৃষ্ণ একটি হাতির ওপর নৃত্য করছেন, একই সঙ্গে বেশ দক্ষতায় ডজন খানেক মানব মূর্তিও উৎর্কীণ করা হয়েছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে কৃষ্ণ তাঁর একজন নবপরীণিতা স্ত্রীর সঙ্গে চাঁদোয়ার নিচে কটি পিঁড়িতে (নিচু করে তৈরী কাঠের আসন) বসেছেন। নববধু লাজনম্রভাবে অবগুন্ঠন দিয়ে আছেন এবং একহাত দিয়ে ধরে আছেন নিজের মাথা। তিনি চকিত দৃষ্টি দিচ্ছেন তাঁর প্রভুর দিকে। এটি বাংলার সুপরিচিত বিয়ের দৃশ্যের প্রতিফলন। কার্ণিসে অলংকৃত বিশৃঙ্খল জনতাদের মধ্যে হাঁটু ও পেছন দিক একটি গামছা পেঁচিয়ে (কাপড়ের টুকরো) হাঁটু ভাঁজ করে গুটিসুটি মেরে নির্লিপ্তভাবে বসে থাকা কৃষ্ণ, এমন দৃশ্যও কেউ খুঁজে পেতে পারেন। এ ভঙ্গি বাঙালিদের মধ্যে দেখা যায় না। তবে এ দৃশ্যের মিল পাওয়া যায় বিহারের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে।

যাহোক, কান্তজীর মন্দিরের চমৎকার পোড়ামাটির অলঙ্করণের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হলো যে, এতে কামদ দৃশ্যাবলির চিত্র অঙ্কন করা হয়নি, যেমনটি দেখা যায় উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরসমূহে।

কান্তজীর মন্দিরের দেওয়ালের ওপর পোড়ামাটির এ বিশাল অলঙ্করণ সে সময়ের জীব ও প্রাণশক্তিরই প্রকাশ ছিল এবং হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের পলিময় মাটিতে লালিত শক্তির ভেতর থেকেই এ শিল্প বেড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের মতো এমন ব্যাপক উর্বর পলিময় ভূমিতে পাথরের অভাব হেতু দেশীয় ধারায় পোড়ামাটি শিল্পের বিকাশ যৌক্তিক কারণেই ঘটেছিল। আদি ঐতিহাসিক যুগে, বিশেষ করে পাল চন্দ্র বংশের আমলে যখন পাহাড়পুর, ময়নামতী, ভাসু বিহার এবং সিতাকোটে বৌদ্ধ মন্দির এবং অন্যান্য ইমারতসমূহ লতা-পাতা ও পোড়ামাটির মূর্তি দিয়ে প্রাণবন্ত ছিল, তখন থেকেই এ রুপকারক শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এ সমস্ত পোড়ামাটির ফলক ছিল বড় আকৃতির এবং কিছুটা সেকেলে ধরণের। কিন্তু কান্তনগর মন্দিরের দেওয়াল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। শিল্পীগণ অত্যন্ত উচ্চমানের পরিশীলিত এবং পরিণত শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, যেখানে সমন্বিত ধারায় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অলঙ্করণ করা হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রাচীন শিল্প ঐতিহ্যের বিপরীতে এবং কিছুটা অসংলগ্ন বিন্যাসে এ মন্দিরের শিল্পের সমন্বয় ঘটেছিল বেশ কিছু স্বতন্ত্র ফলকে এবং বিস্তৃতভাবে শিল্প প্রকরণের যে সমন্বিত রুপের প্রকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে এক ধরণের ছন্দ লক্ষ করা যায়। এরই প্রভাবে কার্পেট ও অন্যান্য সূচী শিল্পে এ ঐশ্বর্যশালী অলঙ্করনের ব্যবহার প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়।

অবস্থান:

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে এবং দিনাজপুর-তেতঁলিয়া সড়কের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে ঢেপা নদীর পারে

**রাজবাড়িঃ**

দিনাজপুর রাজবাড়ি দিনাজপুর শহরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন মাত্র। আদিতে প্রতিরক্ষা পরিখা ও উচুঁ প্রাচীর বেষ্টিত দিনাজপুর রাজবাড়ির বর্তমান পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তুপে প্রবেশের জন্য পশ্চিম দিকে একটি উচুঁ খিলানপথ রয়েছে। প্রবেশ পথের বাম দিকে মূল প্রাসাদ এলাকার মধ্যে খোলা জায়গায় রয়েছে একটি কৃষ্ণ মন্দির। ডানদিকে রয়েছে প্রাসাদের বহির্বাটির কিছু ধ্বংসাবশেষ ও অপর একটি প্রবেশ পথ। বর্গাকার চত্বরটির পূর্বপার্শ্বে রয়েছে চত্বরমূখী সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি মন্দির। চারটি সেমি-কোরিনাথিয়ান স্তম্ভের উপর মন্দিরের সামনের বারান্দা এবং অপর এক সেট কলামের উপর মূল হল ঘরটির ছাদ ন্যস্ত।

দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদটি এখন শুধুই পরিত্যক্ত ইটের সমাহার। ভবনগুলি ভেঙ্গে খন্ড খন্ড হয়ে যাওয়ার শেষ পর্যায়ে উপনীত। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজা ও জমিদার রাজবাড়ির বিভিন্ন অংশ নির্মাণ করলেও মূল প্রাসাদ ভবনটি তিনটি প্রধান মহলে বিন্যস্ত। এগুলি আয়না মহল, রানী মহল ও ঠাকুরবাড়ি মহল হিসেবে

পরিচিত। প্রাসাদ এলাকায় বেশ কয়েকটি মন্দির, রেস্ট হাউস, দাতব্য চিকিৎসালয়, দিঘি এবং বিভিন্ন কর্মচারী ও পোষ্যদের আবাসস্থল নির্মাণ করা হয়েছিল।

এ সকল দালান-কোঠা এবং পূর্ব ও দক্ষিণের দুটি বৃহৎ দিঘি, পরিখা, বাগান, একটি বিলুপ্ত চিড়িয়াখানা, একটি টেনিস কোর্ট, কাচারি ও কুমার হাউসসহ রাজবাড়িটি প্রায় ১৬.৪১ একর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। মূল মহল ও এর সংলগ্ন পরিখা সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা প্রাণনাথ ও তাঁর পোষ্যপুত্র রামনাথ নির্মাণ করেছিলেন। প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল ইউরোপীয়, মুসলিম ও হিন্দু রীতির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে, যা খুব একটি দৃষ্টিনদন হয় নি। রামডাঙ্গা নামক দুটি সমান্তরাল পরিখা প্রাসাদটি ঘিরে ছিল। পরিখাটি সম্ভবত আলীবর্দী খানের শাসনামলে রংপুরের ফৌজদার সৈয়দ আহমেদ খানের আক্রমণের পরই রামনাথ খনন করেছিলেন।

আয়না মহল নামে পরিচিত পূর্বমুখী দ্বিতল মূল প্রাসাদটির অধিকাংশই এখন ধসে পড়েছে। এ ধ্বংসাবশেষে অথবা টিকে থাকা সামান্য কিছু নিদর্শনের মাঝে বা চুর্ণ-বিচুর্ণ পাথরের কোথাও এর পূর্বের কাচের মোজাইক চোখে পড়ে না। পূর্বদিকের ৪৫.৭২ মিটার ফাসাদে ৩.০৫ মিটার প্রশস্ত একটি বারান্দ রয়েছে। ব্যালকনির উভয় পার্শ্বে দুটি প্রশস্ত প্যাঁচানো সিড়ি দোতালায় উঠে গেছে। সম্মখভাগের বারান্দাটির নিচে রয়েছে গ্রিক আয়োনিক রীতির স্তম্ভের সারি। জোডায় জোড়ায় সহাপিত স্তম্ভগুলিতে আবার রয়েছে গোলাকৃতির ব্যান্ড। একটি মাত্র আয়তাকার প্যানেল ব্যতীত উপরের প্যারাপেটটি সমতল। প্যারাপেট থেকে সামান্য উচু আয়তাকার প্যানেলটিতে রয়েছে রাজকীয় চিহ্নের মাঝে রিলিফ করা মুখোমুখি দুটি হাতি ও মুকুটের নকসা। মহলটির মেঝে সাদা-কালো মার্বেল পাথর দ্বারা এবং ছাদ, বিশেষ করে দরবার হল, জলসা হল, তোষাখানা ও পাঠাগার, স্টাকো পদ্ধতিতে চকচকে করা হয়েছে।

পশ্চিমের মূল প্রাসাদ বস্নকের পেছনে রয়েছে রানী মহল ও ঠাকুরবাড়ি মহলের দ্বিতল বর্গাকার বস্নক। একদা এ সমস্ত অসাধারণ সুন্দর নিদর্শনের রিলিফ, খোদিত নকশা ও সমস্ত মূল্যবান বস্ত্তই বর্তমানে খুলে নেওয়া হয়েছে।

 **চেহেলগাজী মসজিদ ও মাজারঃ**

চেহেলগাজী মসজিদ ও মাজার দিনাজপুর জেলার সদর থানার চেহেলগাজী গ্রামে অবস্থিত। দিনাজপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ৭ কিঃমিঃ উত্তরে পাকা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদটির অবসহান। চেহেলগাজী মাজারটি মসজিদ সংলগ্ন।

মসজিদের সময়কাল নির্দেশক তিনটি শিলালিপি গিল। এর একটি দিনাজপুর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এ শিলালিপি থেকে জানা যায়, ৮৬৫ হিজরির ১৬ সফর (১৪৬০ খ্রিঃ ১ ডিসেম্বর) মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ এর রাজত্বকালে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) তাঁর উজির ইকরাব খানের নির্দেশে পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত জোর ও বারুক (দিনাজপুর) পরগণার শাসনকর্তা (ফৌজদার ও জংদার) উলুঘ নুসরত খান এ মসজিদটি নির্মাণ করেন।

বর্তমানে মসজিদটির দেয়াল ছাড়া আর কোন অংশ অবশিষ্ট নেই। দেয়ালগুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং ভগ্নপ্রায়। দেয়ালে কোন অলঙ্করণ দেখা যায় না। তবে মিহরাবের কাছে কিছু পোড়ামাটির ফলক এখনো বর্তমান। এগুলির বেশির ভাগই খুলে পড়ছে।

বর্গাকার মসজিদটির মূলক স্তম্ভের উপর একটি এবং পূর্বদিকের বারান্দার উপর সম্ভবত তিনটি গম্বুজ ছিল। মসজিদ পরিকল্পনার এ রীতিটি মুগল যুগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

বাইরের দিকে মসজিদের মূলক স্তম্ভের আয়তন ৪.৯০ মি x৪.৯০ মি। মূলক স্তম্ভের পূর্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে দুটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। পূর্বদিকের তিনটি প্রবেশপথের মধ্যে মাঝের খিলানের উচ্চতা ২.৬০ মিটার এবং প্রস্থ ০.৭৭ মিটার।

পূর্বদিকের বারান্দার দৈর্ঘ্য ৪.৯০ মিটার এবং প্রস্ত্ত ১.৮৩ মিটার। বারান্দায় প্রবেশের জন্য মূলকস্তম্ভের পূর্ব দিকের অনুরূপ আয়তন বিশিষ্ট তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের ভেতরে পশ্চিমদিকে রয়েছে তিনটি মিহরাব। মাঝের মিহরাবটি পাশের দুটির তুলনায় একটু বড়। মিহরাবগুলি বহুপত্র (multi-cusped)খিলানবিশিষ্ট। মিহরাবের অলঙ্করণে পাথর দেখা যায়। পাথর ও পোড়ামাটির ফলক দিয়ে এ মিহরাবগুলি সুন্দরভাবে অলংকৃত। পোড়ামাটির ফলকগুলির মধ্যে ফুল, লতাপাতা এবং ঝুলন্ত মোটিফ লক্ষণীয়।

কেউ কেউ মনে করেন, বর্গাকার একটি শিবমন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে এ ধারণার পেছনে কোন যুক্তি নেই। মিহরাব, গম্বুজ, প্রবেশপথ এবং স্থাপত্যকৌশল সম্পূর্ণরূপে একটি মসজিদের। মন্দিরের গঠনপদ্ধতির সঙ্গে এর কোন মিল নেই। তবে এখানে প্রাপ্ত বিরাট গৌরীপট্ট শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন, প্রাচীন আমলের পাথর ও ইট, প্রাক-মুসলিম আমলের বাঁধানো ঘাটসহ দুটি জলাশয়, সে আমলের অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ইত্যাদি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এখানে হিন্দুমন্দিরসহ একটি সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ইট-পাথর এ মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা যায়।

মাজারটির সময়কাল নির্দেশক কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি।  দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক মি. ওয়েস্টমেকট ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে চেহেলগাজী মসজিদ থেকে তিনটি শিলাপিপি উদ্ধার করেন। এ শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দে চেহেলগাজী মসজিদটি নির্মাণ করার সময় মাজারটি (রওজা) সংস্কার করা হয়। অর্থাৎ মসজিদের পূর্বেই মাজারটির অস্তিত্ব ছিল। শিলালিপিতে চেহেলগাজী বা অন্য কোন নামে উল্লেখ নেই। বুকানন হ্যামিল্টনের প্রতিবেদন থেকে প্রথম চেহেলগাজী মাজার সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া মার্টিনের গ্রন্থেও মাজারটি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথাও এর সময়কাল সম্পর্কে তথ্য নেই।

স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, ৪০ জন গাজীকে (ধর্মযোদ্ধা) একত্রে এখানে সমাহিত করা হয়। এজন্য এ স্থানের নাম হয় চেহেল (চল্লিশ) গাজী। গোপাল নামক এক স্থানীয় হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে উক্ত গাজীরা যুদ্ধ করে শহীদ হন। সম্ভবতঃ সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ এর কামরূপ অধিকারের সময় (১৩৫৮) এ যুদ্ধ হয়। এ রকম কান্তনগরে (গড় মল্লিকপুর) এবং খানসামায় আরো দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও নিহত সৈনিকদের যৌথভাবে সমাহিত করা হয়। প্রায় ১০০ বছর পরে ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাজারটি মেরামত করা হয়।

মাজারের উপরে কোন আচ্ছাদন বা ছাদ ছিল না। ১৯৬৮ সালে এ মাজারের উপরে ছাদ নির্মাণ করা হয়, চারপাশে দেয়াল তৈরী করে মাজারটিকে আবৃত করা হয় মূল্যবান রেশমি কাপড়ে এবং নির্মিত হয় তোরণ। নবনির্মিত ঘরটির আয়তন ২৫.১৫ মিঃ× ৮.৫০ মিঃ। ছাদের নিচে কবরকে ঘিরে আরেকটি রেলিং সংযুক্ত হয়। রেলিং এর আয়তন ২০.৬০ মিঃ×৪.১০ মিঃ। মাজার সংলগ্ন পূর্বদিকে একটি, দক্ষিণদিকে তিনটি বাঁধানো প্রাচীন কবর রয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চেহেলগাজী মসজিদ, মসজিদের দক্ষিণে আরও একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোনে ১৭০ মিঃ× ৯৭ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি প্রাচীন পুকুর রয়েছে। পূর্বদিকে এর চেয়ে ছোট আর একটি প্রাচীন পুকুর অবস্থিত। মাজারের পশ্চিম দিকে শালবন।

মাজারের প্রবেশ পথের বামদিকে রয়েছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ১৩৫ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার কবর। দিনাজপুর মহারাজা স্কুলে ৬ এবং ৭ নং সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা যখন পাক বাহিনীর ফেলে যাওয়া অসংখ্য মাইন সংগ্রহ ও সংরক্ষণে নিয়োজিত, তখন ৬ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে এক আকস্মিক বিস্ফোরণে বহুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা শাহাদৎ বরণ করেন। তাদের মধ্যে ১৩৫ জন শহীদকে এখানে সমাহিত করা হয়। বর্তমানে এখানে একটি শহীদ স্মৃতিফলক নির্মিত হয়েছে। বিস্ফোরণে শহীদ ২১১ জনের নামের তালিকা তিনটি ফলকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

**ঘোড়াঘাট দুর্গঃ**

ঘোড়াঘাট দূর্গের মসজিদ দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে করতোয়া নদীর ডান তীরে অবস্থিত। দুর্গ এলাকার অভ্যন্তরে অনেকগুলি ধর্মীয় ও ঐতিহ্যিক ইমারত নির্মিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে কেবল ধ্বংসোন্মুখ অবসহায় মসজিদটি এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঢিবি টিকে আছে।

শিলালিপি অনুসারে সরকার ঘোড়াঘাটের জনৈক মুগল ফৌজদার জয়নাল আবেদীন ১৭৪০-৪১ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির বর্তমান অবস্থা এমন যে, এর তিনটি গম্বুজই ভেঙ্গে পড়েছে, পার্শ্ব বুরুজগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত, পশ্চিম দেওয়ালও ভেঙ্গে পড়েছে, আর বাকি অংশে ছোট ছোট গাছপালা জন্মেছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ বর্তমানে ধ্বংসস্তুপে পরিপূর্ণ। এর সামনে ছিল একটি বাঁধানো অঙ্গন, বর্তমানে সেটি জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বিশালাকৃতির দুটি ফাঁপা  অষ্টকোণাকার বুরুজ ছিল, যার ভিত্তি এখনো টিকে আছে। এ বাঁধানো অঙ্গনের দক্ষিণে একটু দূরে রয়েছে বড় একটি পাথরের কূপ, যা সম্ভবত নির্মিত হয়েছিল ওযুর উদ্দেশ্যে।

ইমারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য ছিল পূর্ব দেওয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে একটি করে চতুর্কেন্দ্রিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। বাইরের দিক বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান শোভিত পূর্ব দেওয়ালের মধ্যবর্তী প্রবেশপথটি দেওয়াল থেকে সামনের দিকে একটি আয়তাকার প্রক্ষিপ্ত অংশে অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণের প্রবেশ পথদ্বয়েও অনুরূপ প্রক্ষাপণ রয়েছে। পূর্ব দেওয়ালের এ তিনটি প্রবেশপথের সমান্তরালে পশ্চিম দেওয়ালে নিশ্চয়ই তিনটি মিহরাব ছিল, বর্তমানে যা চাপা পড়ে আছে ধ্বংসস্ত্তপের নিচে।

চারকোণের অষ্টাভুজাকৃতির পার্শ্ব বুরুজগুলি বর্তমানে অনুভুমিক কার্নিস পর্যন্ত উচুঁ। তবে প্রকৃতপক্ষে এগুলি সম্ভবত ছাদের উপরে প্রলম্বিত ছিল এবং এর শীর্ষে ছিল নিরেট ছত্রী ও ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ(cupola)। ইমারতটির পাশেই এদের ভগ্নাংশ পড়ে রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ভেঙ্গে যাওয়া এ বুরুজগুলির ভিত্তিতে ছিল দৃষ্টিনন্দন ’কলস’ মোটিফ। মসজিদের তিনটি বে’র উপর ছিল তিনটি গম্বুজ, প্রশস্ত এবং নিরেট খিলান গম্বুজগুলির ভার বহন করত। পূর্ব দেওয়ালে এবং দুপাশের দেওয়ালে খিলানের চিহ্ন এখনও স্পষ্টভাবেই দেখা যায়।

পূর্ব দেওয়ালের বাইরের অংশে অনেকগুলি অগভীর খোপ নকশা (panel)রয়েছে, বর্তমানে গাছপালা জন্মে সেগুলি ভরাট হয়ে গেছে। এগুলিই বর্তমানে এ পুরো ইমারতের গায়ে টিকে থাকা একমাত্র অলংকরণের নিদর্শন।

১৯৮০’র দশকের শেষ দিকে দুর্গের অভ্যন্তরে একটি ঢিবি খনন করতে গিয়ে আরেকটি মসজিদ আবিস্কৃত হয়েছে। উপরিউক্ত মসজিদটি থেকে প্রায় ২০০ গজ পশ্চিমে দুর্গের পশ্চিমদিকের বেষ্টনী প্রাচীর ঘেঁসে এর অবস্থান। উৎখননে মসজিদটি  অংশিক উন্মোচিত হয়েছে।

 **সীতাকোট বিহারঃ**

সীতাকোট বিহার দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত একটি বৌদ্ধ বিহার। এই স্থাপত্যটি পরিকল্পনায় প্রায় বর্গাকৃতির (পূর্ব-পশ্চিমে ৬৫.২৩ মি এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬৪.১১ মি)। বিমারটির উত্তর এবং দক্ষিণ বাহুদ্বয় বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত ছিল। প্রশস্ত মুখপাত(frontage)বিশিষ্ট তোরণ কমপ্লেক্সটি উত্তর বাহুর মধ্যাংশে অবস্থিত। তোরণ অংশে ছিল ছুটি প্রহরীকক্ষ। বিহারের প্রবেশ পথটি ছিল উন্মুক্ত জায়গা দিয়ে একটি  প্রবেশ কক্ষের দিকে। প্রবেশ কক্ষটি ছিল বিহার কক্ষের সারিতে একই রেখায়। পূর্ব বাহুর উত্তরাংশে পেছনের দেওয়াল ভেদ করে একটি সম্পূরক প্রবেশপথ ছিল। দক্ষিণ বাহুর বহির্মূখী অভিক্ষেপটি ছিল একটি হল ঘরের মতো এবং সেই হল ঘরে ঢুকতে হতো ভেতর দিক দিয়ে।

বিহারটিতে ৪১টি কক্ষ ছিল, উত্তর বাহুতে ৮টি এবং অন্য তিন বাহুতে ১১ টি করে। কক্ষগুলি ছিল প্রায় সমআয়তনের (৩.৬৬মি×৩.৩৫ মি)। কক্ষগুলির পেছনের দেওয়ালে কুলুঙ্গি ছিল এবং কক্ষগুলি দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত ছিল। বিভাজক দেওয়ালের পুরুত্ব ছিল ০.৯১ মিঃ থেকে ১.২২ মি এবং পেছনের দেওয়ালের পুরুত্ব গিল ২.৫৯ মি, কিন্তু সম্মুখের দেওয়ালের পুরুত্ব ছিল ১.০৭ মি।

বিহারের ভেতরের দিকে ২.৫৯ মি প্রশস্ত একটি অভ্যন্তরীণ টানা বারান্দা ছিল। ১.৬৮ মি লম্বা এবং ১.০৭ মি প্রশস্ত দরজার মাধ্যমে বিহারের কক্ষগুলি অভ্যন্তরীণ টানা বারান্দার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। একটি ১.২২ মি পুরু এবং ০.৭৬ মি উচ্চতা বিশিষ্ট দেয়াল সমগ্র বারান্দাকে অঙ্গিনা থেকে আড়াল করে রাখত। বিহারের পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রীয় কক্ষত্রয় অন্যান্য সাধারণ কক্ষের তুলনায় আয়তেনে বড় ছিল। প্রতিটি কেন্দ্রীয় কক্ষের একটি করে ইটের বেদি ছিল। সেখানে পূজার মূর্তি রাখা হতো । খুব সম্ভবত দক্ষিণ দিকে কেন্দ্রীয় কক্ষটি ছিল প্রধান মন্দির। প্রধান মন্দিরটির সম্মুখে স্তম্ভ শোভিত প্যাভিলিয়নটি মন্ডপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে।

বিহার ভবনের দক্ষিণ দিকে একটু দূরে কিন্তু মূল ভবনের সঙ্গে আবৃত পথ দ্বারা সংযুক্ত সম্মুখভাগে বারান্দাসহ পাঁচটি কক্ষ পাওয়া যায়।  পন্ডিতদের অভিমত এগুলি শৌচাগার হিসেবে নির্মিত হয়েছিল।

ছাদ ঢালাইয়ের জন্য চুন, সুরকি এবং ভার বহনের জন্য কড়িকাঠের ব্যবহার দেখা যায়। সীতাকোট বিহার আঙ্গিনার মধ্যবর্তী স্থানে প্রধান মন্দির ছিল না। এখানে পাহাড়পুর, শালবন বিহার এবং আনন্দ বিহারের মতো ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির ফলক অনুপস্থিত। তবে আকার আয়তনের দিক দিয়ে সীতাকোট বিহারের সঙ্গে বগুড়ায় অবস্থিত ভাসু বিহারের অনেক মিল রয়েছে।

ব্রোঞ্জনির্মিত একটি বোধিসত্ত্ব পদ্মাপাণি এবং বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্তি সীতাকোট বিহার থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন।  মূর্তি দুটির গঠনশৈলী থেকে অনুমান করা যায়, এগুলি ৭ম-৮ম শতাব্দীতে তৈরী। বিহার নির্মাণ সম্পর্কে দুটি নির্মাণকালের কথা বলা হলেও স্তরবিন্যাস পদ্ধতিতে বিহারের কাল নির্ধারণ করা হয় নি।

**সুরা মসজিদঃ**

সুরা মসজিদ দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার সুরায় অবস্থিত। ঘোড়াঘাট ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং একই দিকে ঘোড়াঘাট উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। মসজিদটি ইট ও পাথরে নির্মিত। এর চারপাশে ছড়িয়ে আছে বেশ কিছুসংখ্যক প্রস্তরফলক। কিছু কিছু প্রস্তরফলকে ছোট সোনা মসজিদে ব্যবহৃত নমুনার প্যানেল ও অন্যান্য ডিজাইন রয়েছে। আহমদ হাসান দানী মনে করেন, মসজিদটি ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিল এবং দেয়ালের গায়ে বেশ উঁচু পর্যন্ত পাথর বসানো ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেয়ালের কোন অংশেই পাথরের কোন চিহ্ন নেই। তাছাড়া দেয়ালগুলোর বহির্গাত্রের অলঙ্করণে শিকল ও ঘন্টার ঐতিহ্যগত মোটিফ অঙ্কিত পোড়ামাটির অলঙ্করণ রয়েছে। দেয়ালগুলিতে যদি পাথর বসানো থাকত তাহলে ইটের উপরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ করা সম্ভব হতো না।

এক গমবুজ বিশিষ্ট বর্গাকার এই মসজিদের সম্মুখভাগে একটি বারান্দা রয়েছে। মসজিদটি একটি উঁচু চত্বরের উপর নির্মিত। পূর্ব পাশ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি চত্বর পর্যন্ত উঠে গেছে। উন্মুক্ত চত্বরটির চার পাশ পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বর্তমানে স্থাপনাটির ভিত পর্যন্তই প্রাচীর রয়েছে। তবে পূর্ব পার্শ্বের প্রবেশদ্বারের উচ্চতা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, মসজিদটিকে বাইরের শব্দ ও কোলাহল থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বেষ্টন-প্রাচীরগুলিও যথেষ্ট উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছিল। বাংলার আর কোন মসজিদে এমন কৌশল আগে কখনো দেখা যায় নি ।

লট্টন মসজিদের পরিকল্পনার অনুসরণে সুরা মসজিদটি নির্মিত। এতে একটি বর্গাকার নামায-কক্ষ আছে, যার প্রত্যেক পার্শের দৈর্ঘ্য ৪.৯ মিটার। সকল কোণে আছে অষ্টভুজ স্তম্ভ, মোট স্তম্ভের সংখ্যা ছয়। কার্নিস রীতিমাফিক বাঁকানো। পূর্ব দিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ আছে। পশ্চিম দিকে আছে তিনটি কারুকার্যখচিত মিহরাব। হলঘরটি একটি গোলার্ধ আকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজটি স্তম্ভের উপর বসানো স্কুইঞ্চের উপর স্থাপিত।

মসজিদের বারান্দা জুড়ে রয়েছে তিনটি গম্বুজ। এই গম্বুজগুলি পেন্ডেন্টিভ পদ্ধতিতে স্থাপিত। ছোট সোনা মসজিদের সঙ্গে এই গম্বুজগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

ইমারতটির বহির্গাত্রে গোলাপ ও অন্যান্য লতাপাতার নকশাখচিত পোড়ামাটির কারুকাজ আছে। জ্যামিতিক আকৃতির কিছু নকশাও দেখতে পাওয়া যায়। ভেতরের মিহরাবগুলি ছিল সম্পূর্ণরূপে পাথরের তৈরী। মধ্যবর্তী মিহরাবটি সূক্ষ্মভাবে কারুকার্যখচিত। শিকল ও ঘন্টার মোটিফ, লতাপাতার নকশা, লেখ্যপটের মোটিফ এবং জ্যামিতিক আকৃতির নকশাগুলি করা হয়েছে বেশ চমৎকারভাবে। গম্বুজগুলির ভিত পোড়ামাটির কারুকার্যখচিত ইট দ্বারা অলঙ্কৃত।

এখান থেকে কোন লিপিফলক পাওয়া যায় নি। নির্মাণশৈলীর ভিত্তিতে আহমদ হাসান দানী মসজিদটিকে হোসেন শাহ আমলের বলে মনে করেন। সম্প্রতি এ স্থান থেকে কয়েক মাইল দৃরে চম্পাতলী নামক স্থানে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এর আমলের একটি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। তাতে ৯১০ হিজরি (১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দ) উল্লেখ আছে। এতে একটি মসজিদ

নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এই লিপিটির সঙ্গে সুরা মসজিদের সম্পর্ক আছে, তাহলে মসজিদটির নির্মাণকাল ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দ বলে ধারণা করা যায়।

**ভাদুরিয়া ইউনিয়নের নির্শ্বা কাজলদীঘি গ্রামের ইতিহাস:**

ভাদুরিয়া ইউনিয়নের  নির্শ্বা কাজলদীঘি গ্রামটি ইতিহাস সমৃদ্ধ। এ গ্রামের  নামকরণ করা হয় কাজলদীঘি নামক বিশাল এক দীঘির  নামে। দীঘিটি অত্র এলাকার জমিদার আশুতোষ  ভট্টাচার্য্যের  পূর্বপুরুষগণ দ্বারা প্রায় দুইশত বছর পূর্বে বা তারও  আগে খনন করা হয়। দীঘিটি ছিল জমিদারের পানীয় জল সংগ্রহের জন্য সংরক্ষিত। দীঘিটির  চার পাশে সারি সারি  তালগাছ এর  শোভা শতগুন  বাড়িয়ে তুলেছিল। দীঘির  স্বচ্ছ জলে নিচের বালুকণাও স্পস্ট দেখা যেত। পারিবারিক কারনে আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের একমাত্র  ভ্রাতা জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য চিরকুমার  ছিলেন। আশুতোষ  ভট্টাচার্য্যে ছিলেন অত্র এলাকার  অত্যন্ত প্রভাবশালী জমিদার। তিনি ছিলেন যেমন প্রজাদরদী তেমনি কঠোর প্রজাশাসক। তাঁর শাসনকালে অত্র এলাকায় অনেক  পুকুর খনন করা হয়ে থাকে। এছাড়া রাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয়, মন্দির, মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে।

নির্শ্বা কাজলদীঘির  এই জমিদার বাড়ীর স্মৃতি  হিসেবে পুরাতন মঠ-মন্দির, জমিদার বাড়ীর ভগ্নাংশ, সীমানা প্রাচীর, প্রাচীন দীঘি, স্মৃতিফলক, জমিদারী কাছারির ভগ্নাংশ আজও  বিদ্যমান। কাজলদীঘির  জমিদার বাড়ীর মন্দিরের  নান্দনিক শিল্পকর্ম উৎকৃষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন । জমিদারগণের জীবদ্দশায়  এই মন্দিরে  দূর্গাপূজার  আয়োজন হতো অত্যন্ত  স্বাড়ম্বরে জমিদার বাড়ীর  মন্দিরে দূর্গাপূজায় মহিষ বলির একটি ঐতিহ্য ছিল। এছাড়া পূজা উপলক্ষে এখানে বসত মেলা। প্রজারা ও বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আশুতোষ জমিদারের বাড়ীর মেলায় ছুটে আসত প্রাণের উচ্ছাসে। নির্শ্বা কাজলদীঘির জমিদারের সম্পত্তির বিস্তৃতি এতদ্ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়ায় একসময়ে ইংরেজ সরকারের কর্মকর্তাদের  পদচারনায় মুখর থাকত এই  জমিদারির কাছারি। প্রচলিত আছে বঙ্গভঙ্গের পর নবগঠিত প্রদেশের  ছোট লাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার  ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে  দিনাজপুর  শহরে এসে কাজলদীঘিতে সফরে আসেন এবং নির্শ্বা কাজলদীঘির জমিদার আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের অভ্যর্থনা ও আতিথিয়তা  গ্রহণ করেছিলেন।

দিনাজপুরের  মহারাজা জগদীশ চন্দ্রের  সাথে যোগাযোগ রাখার স্বার্থে  দিনাজপুরের শহরের বালুবাড়ীতে কাজলদীঘির  জমিদারের বিশাল আয়তনের একটি বাড়ী ছিল। এছাড়া নিমনগর  এলাকায় ছিল বাগান বাড়ী। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ এবং ১৯৪৯ সালে বঙ্গীয়  প্রজাস্বত্ব  আইন পাশ হওয়ার পর জমিদারী প্রথা বাতিল হলে জমিদার জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিনাজপুরে আবাস গ্রহণ করেন এবং কিয়ৎকাল  পরে মৃত্যুবরণ করেন। জমিদার আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের উত্তরসুরীগণও দিনাজপুরে  আবাসন গ্রহণ করেন এবং বালুবাড়ী মৌজায় বিশালায়তনের বাড়িটিতে  আমৃত্যু বসবাস করেন। জমিদারের  উত্তরপুরুষগণ আজও দিনাজপুর শহরে বসবাস করছেন বলে শোনা যায়।

নির্শ্বা কাজলদীঘির  জমিদার বাড়ী, মন্দির, কাছারি ঘর, মঠ আজ ভূমিদস্যুদের কবলে। ধীরে ধীরে এই ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন ধ্বংসের  মুখে পতিত হচ্ছে। মন্দির ও জমিদার বাড়ীর সম্পত্তি  বিভিন্ন ব্যক্তি ভোগ দখল করে চলেছে। নির্শ্বা কাজলদীঘির  ঐতিহ্য কাজলদীঘি  অরক্ষিত হয়ে পড়ে আছে। পুকুর পাড় দখল হয়ে গেছে অনেক আগেই। কেটে ফেলা হয়েছে কাজলদীঘির  পাড়ের তালগাছ গুলো। পুকুর পাড়ের মাটি কেটে  নষ্ট করা হচ্ছে এর সৌন্দর্য। সংরক্ষনের অভাবে আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যান্য প্রাচীন দীঘিগুলো ভরাট করার চেষ্টাও  করছে অনেকে। ভাদুরিয়া ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ী আজও বহন করে চলেছে অত্র এলাকার অতীত  গৌরব ও ইতিহাসের স্মৃতি চিহ্ন।

নয়াবাদ মসজিদঃ

নয়াবাদ মসজিদ দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের নয়াবাদ গ্রামে অবস্থিত। জেলা সদর থেকে ২০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে ঢেপা নদীর পশ্চিম তীরে এর অবস্থান। ১.১৫ বিঘা জমির উপর মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক মসজিদটি সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদের সামনে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে।

মসজিদের প্রবেশদ্বারের ওপর ফারসি ভাষায় রচিত লিপি থেকে জানা যায়, সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময় ২ জ্যৈষ্ঠ, ১২০০ বাংলা সনে (১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের নির্মাণ সম্বন্ধে জনশ্রুতি অনুযায়ী আঠারো শতকের মধ্যভাগে যখন বিখ্যাত কান্তজী মন্দির নির্মিত হয়, তখন পশ্চিমা দেশ থেকে আগত মুসলিম স্থাপত্যকর্মীরা পার্শ্ববর্তী নয়াবাদ গ্রামে মোকাম তৈরী করেন এবং সেখানে এ মসজিদ নির্মাণ করেন।

তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি আয়তাকার। এর চারকোণায় রয়েছে চারটি অষ্টভুজাকৃতির টাওয়ার। বাইরের দিক থেকে মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১২.৪৫ মিটার এবং প্রস্থ ৫.৫ মিটার। দেয়ালের প্রশস্ততা ১.১০ মিটার। মসজিদে প্রবেশের জন্য পৃর্বদিকে রয়েছে তিনটি খিলান। মাঝের খিলানের উচ্চতা ১.৯৫ মিটার, প্রস্থ ১.১৫ মিটার। পাশের খিলানদ্বয় সমমাপের এবং অপেক্ষাকৃত ছোট।

উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে দুটি জানালা রয়েছে। প্রবেশদ্বার ও জানালার খিলান বহু খাঁজযুক্ত (multi-cusped)। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দিকে রয়েছে তিনটি মিহরাব। মাঝের মিহরাবের উচ্চতা ২.৩০ মিটার এবং প্রস্থ ১.০৮ মিটার। দুই পাশের মিহরাব দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। মসজিদের তিনটি অর্ধগোলাকৃতির গম্বুজের মধ্যে মাঝেরটি অন্য দুটির তুলনায় কিছুটা বড়। গম্বুজের অবস্থান্তর পর্যায়ে পেন্ডেন্টিভ ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের কার্নিশ এবং প্যারাপেট সমান্তরাল।

মসজিদের চার কোণের কর্নার টাওয়ারের মধ্যে ২টির উপর (উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম কোণের) কুপলা রয়েছে। বাকি দুটির উপরে ছোট গম্বুজ। গম্বুজদ্বয় বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কর্নার টাওয়ারগুলি সাদামাটা ইট ও পলেস্তারা দিয়ে তৈরি। কর্নার টাওয়ারের গায়ে চারটি ব্যান্ড আছে। টাওয়ারগুলি ক্রমশ সরু, উপরে ছোট গম্বুজ।

সমস্ত দেয়াল জুড়ে আয়তাকার বহু পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। পোড়ামাটির নকশাগুলি বহু জায়গায় খুলে পড়েছে। ফলকগুলির আয়তন ০.৪০ মি×০.৩০ মি । ফলকগুলির মধ্যে লতাপাতা ও ফুলের নকশা রয়েছে। একটিতে জোড়া ময়ুরের প্রতিকৃতিও রয়েছে। এরূপ মোট ১০৪টি আয়তাকার ফলক রয়েছে, তবে ফলকের মধ্যে অলংকরণের অনেকটাই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

হরিনাথপুর দুর্গনগরী

দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ১০ কিমি দক্ষিণ-পুর্বে শালবনের ভেতরে এই দুর্গনগরী অবস্থিত।প্রাচীন দুর্গনগরীর স্থলে এখানে গড়ে উঠেছে হরিনাথপুর রাজার নামে বিদ্যালয়।স্থানটি বর্তমানে সমতল এবং চাষাবাদের জমিতে পরিণত হয়েছে।তবে এখনও এখানকার মাটিতে প্রাচীন কালের ইট পাওয়া যায়।নোয়াখালি থেকে আগত কিছু পরিবার এখানে বসতি স্থাপন করায় এলাকাটি এখন নোয়াখালি পাড়া নামে পরিচিত।দুর্গনগরীর পরিখার অস্তিত্ব এখনও পরিদৃষ্ট হয়।

হিরাজিরার ধাপ

রংপুর-পার্বতীপুর রেললাইনের উত্তরে করতোয়া নদীর মরাখাতের পশ্চিম দিকে নদীর পাড় থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে প্রায় ২ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।স্থানীয়ভাবে একে হিরাজিরার ধাপ বলা হয়।এ স্থানে অপেক্ষাকৃত উঁচুভূমিতে একটি কবরস্থান আছে।এ কবরস্থান থেকে ১৫০ মিটার উত্তর-পূর্বে মৃতপ্রায় করতোয়া নদীর ওপর একটি পাকা সেতু নির্মাণ করার সময় নদীর শুষ্ক তলদেশ থেকে মাটি ও ধাতু নির্মিত তৈজসপত্র,কাঠের আসবাবপত্রের ভগ্নাবশেষ,বেশ কয়েকটি মানুষের মাথার খুলি,স্বর্ণালঙ্কার ও কিছু ধাতব মুদ্রা পাওয়া গেছে।এখানকার মাটি খনন করে সুলতানী আমলের চাকচিক্যময় পাত্রের ভগ্নাংশও পাওয়া গেছে।অনুমান করা যায়,এটি বর্ধনকোট রাজবংশের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর অংশবিশেষ।বর্তমানে এখানে তেমন কোন প্রাচীন নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রাচিন বেলওয়া নগরী

দিনাজপুর জেলার রানিগঞ্জ বাজারের কাছেই বেলওয়ার অবস্থান । বেলওয়া ঘোড়াঘাট ঊপোজেলার অন্তর্গত । এখানে সম্ভবত গুপ্ত যুগে এমনকি তারও আগে একটি বড় শহর ছিল। এখান থেকে পাল যুগের দুটি তাম্রলেখ পাওয়া গেছে যার এক্তি প্রথম মহিপালের ও অন্যটি তৃতীয় বীগ্রহ পালে।

বারো পাইকের গড়

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা থেকে ৫ কিমি উত্তরে এবং বেলওয়া থেকে ৪ কিমি পূর্বে মইলা নদির তীরে প্রাচিন এ দুরগ অবস্থিত। ঐতিহাসিকদের মতে কাম্রুপের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্তরক্ষা্র জন্য পাল আমলে এ দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল ।



মোঃ রবিউল ইসলাম

ডিইও

উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস

ফুলবাড়ী,দিনাজপুর